بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

‘ঈদে মিলাদুন্নবীর প্রেক্ষাপট এবং মহানবী (সা.)–এর অনুপম জীবনাদর্শ’

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১৩ই মার্চ ২০০৯-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশঃ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, দু-তিন দিন পূর্বে ১২ই রবিউল আউয়ালে ছিল মহানবী (সা.)-এর জন্মদিন। মুসলমানদের একটি অংশ অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এ দিনটি উদ্‌যাপন করে থাকে। পাকিস্তানেও এবং পুরো উপমহাদেশে অনেকে এই দিনটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমাদের বিরুদ্ধবাদী এবং আপত্তিকারীদের অনেকে আমাকে লিখে আবার আহমদীদের কাছেও জিজ্ঞেস করে, আহমদীরা এই দিনটি কেন যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করে না। এ প্রসঙ্গে আজ আমি কিছুটা আলোকপাত করবো।

প্রকৃতপক্ষে আহমদীরাই যে এই দিনটির মূল্যায়ন করতে জানে তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে সুস্পষ্ট হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করার পূর্বে ঈদে মিলাদুন্নবী কবে থেকে উদ্‌যাপন আরম্ভ হয়েছে আর এর ইতিহাস কী– তাও আমি আপনাদের অবহিত করছি।

মুসলমানদের মধ্যেও বিভিন্ন ফিরকা ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপনে বিশ্বাসী নয়। ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে– যেগুলোকে উত্তম শতাব্দী বলা হয়– তখনকার মানুষের মাঝে নবী আকরাম (সা.)-এর প্রতি যে ভালবাসা দেখা যেত তা ছিল সর্বোচ্চ মানের। তারা সবাই সুন্নত সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত এবং শরিয়তের অনুবর্তীতায় তাঁরা সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন। তা সত্ত্বেও ইতিহাস আমাদেরকে একথাই বলে যে, কোনো সাহাবী বা তাবেঈ, সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা সাহাবীদের দেখেছেন, তাদের যুগে ঈদে মিলাদুন্নবীর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেই ব্যক্তি– যিনি এর প্রবর্তন করেছেন– তার নাম হচ্ছে, আব্দুল্লাহ্ বিন মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ কাদাহ্। তার অনুসারীরা নিজেদেরকে ফাতেমী বলে দাবি করে এবং তারা নিজেদেরকে হযরত আলী (রা.)-এর আওলাদ বলে দাবি করে। বাতেনী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার সাথে এদের সম্পর্ক ছিল। বাতেনী ধর্ম হচ্ছে, শরিয়তের কতক অংশ প্রকাশিত আবার কতক অংশ অপ্রকাশিত বলে যারা বিশ্বাস করে। উদাহরণস্বরূপ এরা এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, ধোঁকা দিয়ে বিরুদ্ধবাদীকে হত্যা করা বৈধ। এ ধরনের বিভিন্ন বিশ্বাস রয়েছে। এরাই ইসলামের ভেতর চরম পর্যায়ের বি'দাত প্রবিষ্ট করিয়েছে, এদের সূত্রেই তা প্রচলিত হয়েছে।

অতএব সর্বপ্রথম যারা ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছে তারা ছিল বাতেনী ধর্মের অনুসারী। আর যেভাবে তারা এর প্রচলন করেছে তা নিশ্চিতরূপে বি'দাত ছিল। ৩৬২ হিজরীতে মিশরে তাদের শাসনকাল ছিল বলে জানা যায়। এ ছাড়াও তারা আরো বিভিন্ন

দিন নির্ধারণ করেছে যা উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। যেমন, আশুরার দিন, ঈদে মিলাদুন্নবীতো আছেই, মিলাদ হযরত আলী, মিলাদ হযরত হাসান, মিলাদ হযরত হোসাইন, মিলাদ হযরত ফাতেমাতুজ্‌ জাহরা, রজব মাসের প্রথম রাত, মধ্যবর্তী রাত, শাবান মাসের প্রথম রাত তারপর খতম এর রাত, রমযানের সূত্র ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এছাড়া আরো অগণিত দিবস তারা উদ্‌যাপন করে থাকে। যার ফলে ইসলামের ভেতর বি'দাতের প্রচলন হয়েছে।

হুযূর (আই.) বলেন, যেভাবে আমি বলেছি, মুসলমানদের ভেতর একটি শ্রেণী বা কতক ফির্কা এমনও আছে যারা এটি উদ্‌যাপন করেন না বরং ঈদে মিলাদুন্নবীকে বি'দাত বলে মনে করেন। অপর শ্রেণী এমন সীমালঙ্ঘন করেছে যা চরম বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। যাই হোক, আমরা দেখবো এ যুগের ইমাম যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা হাকাম ও ন্যায়বিচারক হিসেবে আবির্ভূত করেছেন, তিনি এ প্রসঙ্গে কী বলেছেন।

এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে মিলাদ পাঠ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি (আ.) বলেন, **'মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করা খুবই উত্তম কাজ। বরং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী এবং আউলিয়াদের স্মরণের ফলে রহমত বর্ষিত হয়। আর স্বয়ং খোদা তা'লাও নবীদের জীবনচরিত আলোচনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু যদি এর সাথে এমন বি'দাত এর সংমিশ্রণ ঘটে যার ফলে তৌহিদ বা খোদার একত্বে কোনোরূপ বিপর্যয় দেখা দেয় তাহলে তা বৈধ নয়। খোদার মর্যাদা খোদাকে এবং নবীর মর্যাদা নবীকে প্রদান করো। বর্তমান যুগের মৌলভীদের মধ্যে বি'দাত শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং সেসব বি'দাত খোদার অভিপ্রায় বহির্ভূত। যদি বি'দাত না হয়, তাহলে তা (মিলাদ) একটি ওয়াজ বা নসীহত। মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব, জন্ম এবং মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা সওয়াবের কাজ। আমরা নিজেদের মনগড়া শরিয়ত বা গ্রন্থ প্রণয়নের ধৃষ্টতা দেখাতে পারি না।'**

এরা এমন বি'দাত বানিয়েছে, যদি মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করতে চাও তাহলে খুবই উত্তম। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে মিলাদের নামে কী করা হয়? বর্তমানে বিশেষভাবে পাকিস্তান এবং ভারতে এসব জলসায় জীবনচরিত আলোচনার পরিবর্তে অনেক বেশি রাজনৈতিক চর্চা হয়। অথবা একে অপরের ধর্ম বা ফির্কার দোষ-ত্রুটি অথবা ছিদ্রান্বেষণের কাজ করা হয়। পাকিস্তানে এরা যেসব জলসা করে তাতে এমন কোনো জলসা নেই যেখানে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয়, বরং প্রত্যেক স্থানেই আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তার প্রতি চরম কদর্যপূর্ণ ও ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করা হয়। তাঁকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে।

সম্প্রতি মৌলভীরা রাবওয়াতে অনেক জলসা করেছে, মিছিল বের করেছে। কিন্তু সেখান থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা যায়, কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং আহমদীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা আর বৈরিতা প্রকাশের জন্যই এই জলসার আয়োজন করেছে। এ ধরনের জলসার কোনো মূল্য নেই। মহানবী (সা.)-এর সত্তা সেই পবিত্র সত্তা, যখন তিনি ধরায় আবির্ভূত হন তখন তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন (সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত) হিসেবে এসেছেন। তিনি শত্রুদের জন্যও কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন। এক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর সাথে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সৌভাগ্য তার হয়েছে। তিনি

(সা.) নামাযে অনবরত এই দোয়াই করতে থাকেন, 'হে আল্লাহ্, এই জাতিকে ক্ষমা করো এবং বিবেক-বুদ্ধি দাও।'

কিন্তু, বর্তমান যুগের মোল্লারা কী করছে? এরা মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের উপর আমল করার পরিবর্তে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে যত প্রকার নোংরা ভাষা প্রয়োগ করা সম্ভব তা করছে এবং আহমদীদের উপর অপবাদ আরোপ করছে। মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ ছিল এরূপ: 'এক যুদ্ধে যখন কোনো সাহাবী শত্রুকে ধরাশায়ী করে, তখন সে (শত্রু) কলেমা পাঠ করা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করার কথা শুনে তিনি (সা.) বলেছিলেন, তুমি কি তার হৃদয় চিড়ে দেখেছিলে? তিনি এতটা রাগান্বিত হন যে, সেই সাহাবী বলেন, কতোই ভালো হতো আমি যদি আজকের পূর্বে মুসলমান না হতাম। কেবল মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করা খুবই উত্তম। এর ফলে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এবং তাঁর অনুসরণের লক্ষ্যে একটি চেতনা ও আবেগ সৃষ্টি হয়। এজন্য পবিত্র কুর'আনেও বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে বলা হয়েছে وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ কিন্তু জীবনচরিত বর্ণনায় যদি বিভিন্ন প্রকার বি'দাতের সংমিশ্রণ করা হয়, তাহলে তা হারাম বা অবৈধ হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তৌহীদ। মিলাদ-মাহফিল এর আয়োজকদের মধ্যে বর্তমানে অনেক বি'দাতের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। যদ্বারা একটি বৈধ এবং রহমতস্বরূপ কর্মকে নষ্ট করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করা রহমতের কারণ। কিন্তু শরিয়ত বহির্ভূত কর্ম এবং বি'দাত আল্লাহ্ তা'লার সঙ্কল্প পরিপন্থী। আপনি নতুন কোনো শরিয়তের ভিত্তি রাখবেন তা আমরা কোনোভাবেই সমর্থন করি না। অথচ বর্তমানে তা-ই হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছা মোতাবেক শরিয়ত প্রবর্তন করতে চায়। মোটকথা, স্বয়ং শরিয়ত বানায়। এ ক্ষেত্রেও উগ্রতা বা শৈথিল্যের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

অনেকে অজ্ঞতাবশত বলে, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করাই হারাম। নাউযুবিল্লাহ্। এটি তাদের নির্বুদ্ধিতা। মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করা বা গুণগান করাকে হারাম আখ্যা দেয়া চরম ধৃষ্টতা। কেননা, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার আনুগত্য খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন বানানোর মাধ্যম এবং প্রকৃত উপায়। আর গুণগানের মাধ্যমেই আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে হৃদয়ে জাগরণ সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে সে তার গুণগান করে। কিন্তু যারা মিলাদ পড়ার সময় দাঁড়িয়ে যায় আর মনে করে যে, মহানবী (সা.) স্বয়ং এসে গেছেন। এটি তাদের দুঃসাহস। এ ধরনের যেসব সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অনেক সময় দেখা যায়, বেশিরভাগ সেইসব মানুষ এতে অংশ নিয়েছে, যারা বেনামাযী। 'অধিক হারে সেসব মানুষ যোগদান করে যারা বেনামাযী, সুদখোর এবং মদ্যপায়ী; এ ধরনের জলসার সাথে মহানবী (সা.)-এর কিসের সম্পর্ক? এরা কেবল একটি বিনোদনের জন্য সমবেত হয়। তাই এরূপ চিন্তা-ভাবনা অনর্থক।

যে ব্যক্তি কট্টর ওয়াহাবী হয় এবং মহানবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বকে হৃদয়ে স্থান দেয় না, সে এক ধর্মহীন মানুষ। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের সত্তাও এক প্রকার বারী হয়ে থাকে। তারা উন্নত মানের আলোকিত সত্তা হয়ে থাকেন। উন্নত গুণাবলীর সমষ্টি হয়ে থাকেন। তাদের ভেতর বিশ্ববাসীর জন্য রহমত থাকে। তাদেরকে নিজেদের মতো মনে করা অন্যায়।

আউলিয়া এবং নবীদের প্রতি ভালবাসার ফলে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, বেহেশত একটি উন্নত স্থান হবে আর আমি তাতে থাকবো। এজন্য সেই সাহাবী যিনি তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তিনি একথা শুনে কাঁদতে আরম্ভ করেন আর বলেন, হুযূর আমি আপনাকে খুবই ভালবাসতাম। তিনি বলেন, তুমিও আমার সাথেই থাকবে। দ্বিতীয় শ্রেণী, যারা

মুশরেকদের রীতি অবলম্বন করেছে, তাদের মাঝেও কোনো আধ্যাত্মিকতা নেই। কবরপূজা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই প্রকৃত কথা হলো, মহানবী (সা.)-এর গুণগান করাকে যেভাবে ওয়াহাবীরা হারাম বলে, আমার দৃষ্টিতে তা নয়। বরং অনুসরণের জন্য এরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত। যারা পৌত্তলিকদের মতো বিভিন্ন বি'দাত সৃষ্টি করে তা হারাম।'

'মহানবী (সা.) কখনও রুটি সামনে রেখে (বিনিময়ে) কুরআন পড়েছেন কি? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করো। যদি তিনি একবারও রুটি সামনে রেখে কুরআন পাঠ করে থাকতেন তাহলে আমরা হাজার বার পড়তাম। একথা সত্য যে, মহানবী (সা.) সুললিত কণ্ঠে কুর'আন পাঠ শুনেছেন এবং তা শুনে তিনি কেঁদেছেনও, যখন এ আয়াত এসেছিল, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (সূরা আন্ নিসা: ৪২) অর্থাৎ এবং তোমাকেও এইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো। তিনি (সা.) কাঁদতে কাঁদতে বলেন, থামো, আমি আর শুনতে পারছি না। সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী কোনো হাফিয পেলে স্বয়ং আমাদের তার কাছ থেকে কুর'আন শোনার আকাঙ্ক্ষা হয়। মহানবী (সা.) প্রতিটি কাজের উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। তা আমাদের করা উচিত। সত্যিকার মু'মিনের জন্য এটি দেখে নেয়াই যথেষ্ট যে, মহানবী (সা.) এই কাজ করেছেন কি করেন নি? যদি না করে থাকেন তাহলে করার নির্দেশ দিয়েছেন কি-না। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর সম্মানিত পূর্বপুরুষ ছিলেন। কিন্তু কী কারণে তিনি তার মিলাদ পড়েন নি?'(আল্ হাকাম ৭ম খণ্ড, ১১ সংখ্যা-পৃ: ৫, ২৪ মার্চ, ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ)।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তির চিঠির উত্তর লেখাতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে যদি বি'দাত না হয় আর জলসা করা হয়, তাতে বিভিন্ন বক্তৃতা দেয়া হয়, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করা হয়, মহানবী (সা.)-এর শানে যদি সুললিত কণ্ঠে বিভিন্ন নযম পাঠ করা হয়, তাহলে এ ধরনের জলসা খুবই উত্তম এবং হওয়া উচিত।'

হুযূর বলেন, মহানবী (সা.)-এর জন্মদিনে জলসা করা বা কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা নিষেধ নয়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, এতে কোনো প্রকার বি'দাত যেন করা না হয়। যেন মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করা হয়। আর কেবল বছরে একদিনই হতে হবে এমনও নয়। জীবনচরিত যদি এমন হয়; যদি প্রেমাস্পদের জীবনচরিত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ উপলক্ষ্যে বছরের বিভিন্ন সময় এই জলসা করা যেতে পারে এবং করা উচিত। আর এটিই আহমদীয়া জামাত করে আসছে।

অতএব আজ আমি অবশিষ্ট সময়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরবো। যাতে আমরাও একে স্বীয় জীবনের অংশ বানানোর চেষ্টা করি। তাহলেই আমরা যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করে খোদার ভালবাসা লাভ করবো। তখনই আমাদের অপরাধ ক্ষমা করা হবে। তখনই আমাদের দোয়া গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করবে।

বর্তমানে মহানবী (সা.)-এর প্রতি যেসব অপবাদ আরোপ করা হয়, তা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। সর্বদাই তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। যখন তিনি নবুওতের দাবি করেন তখন কাফিরদের ধারণাও এমনই ছিল: সম্ভবত কোনো পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে তিনি এই দাবি করেছেন। ফলে চাচার মাধ্যমে তাঁকে সংবাদ পাঠানো হলো যে, আপনি আমাদের ধর্ম, আমাদের প্রতিমাসমূহ সম্পর্কে কথা বলা পরিত্যাগ করুন এবং স্বীয় ধর্মের প্রচারও করবেন না। তাহলে এর বিনিময়ে আমরা আপনার

নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত। আমাদের পার্থিব শান-শওকত সবই আপনার পদতলে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি। আমাদের ধন-সম্পদ, আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারী আপনাকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তিনি উত্তর দিয়েছেন, যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয় তবুও আমি আমার দায়িত্ব পালন হতে বিরত হবো না। তাদের দোষ-ক্রটি তাদের সম্মুখে তুলে ধরে তাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করার জন্যই আমি আবির্ভূত হয়েছি। যদি এ জন্য আমাকে মৃত্যুও বরণ করতে হয় তাহলে আমি সানন্দে তা কবুল করবো। এ পথে আমার জীবন উৎসর্গিত। মৃত্যুভয় আমাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আর কোনো প্রকার পার্থিব প্রলোভনও এ পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না।

হুযূর বলেন, তিনি (সা.) কাফিরদের সকল প্রলোভনকে পায়ে ঠেলে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আমি এই পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ধন-সম্পদের জন্য লালায়িত নই। বরং আমি তো আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। সর্বশেষ নবী যিনি সমগ্র বিশ্বে এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান খোদার পতাকা প্রোথিত করবেন। আল্লাহ্ তা'লাও তাঁর প্রতি আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁকে দিয়ে এই কথা ঘোষণা করিয়েছেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সূরা আল্ আন্'আম: ১৬৩)। **অর্থ: 'তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামায এবং কুরবানী-আমার জীবন ও মরণ সবই আল্লাহ্র জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক।'**

অতএব এই ছিল তাঁর মোকাম বা পদমর্যাদা। আপাদমস্তক খোদার ভালবাসায় নিমগ্ন হয়ে যা তিনি লাভ করেছিলেন। পার্থিব ধন-সম্পদে তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি এক ও অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি সকল প্রকাল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি বিশ্ববাসীকে বলেছেন, যদি তোমরা অনন্ত জীবন চাও তাহলে আমার আনুগত্য করো। সেভাবে নামায পড়ার এবং সেই মান অর্জন করার চেষ্টা করো যার দৃষ্টান্ত আমি প্রতিষ্ঠা করেছি। ইবাদতে নিমগ্ন হওয়াতেই জীবনের নিশ্চয়তা। আর কুরবানীর মাধ্যমে আসল মৃত্যুর পূর্বে সেই মৃত্যু অবলম্বন করো যার উন্নত মান আমি প্রতিষ্ঠা করেছি। এর ফলে যখন মৃত্যু আসবে তখন এক অনন্ত জীবন আরম্ভ হবে, যা মানুষকে খোদার সন্তোষভাজন বানাবে।

আজ মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতকেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভয়-ভীতি দেখানোর চেষ্টা করা হয়। পাকিস্তানের সর্বত্রই, প্রতিদিন কিছু না কিছু হচ্ছে। ভারতেও মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় আহমদীদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। বিশেষভাবে নবাগতদের চরম ভয়-ভীতি দেখানো হয়। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, ইউরোপের দেশ বুলগেরিয়া থেকে সম্প্রতি রিপোর্ট এসেছে, সেখানেও আহমদীদের জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। সেখানকার মুফতির নির্দেশে। বুলগেরিয়া সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভূক্ত হয়েছে। এ অঞ্চলে মুসলমানদের বিশাল সংখ্যা রয়েছে। সেখানকার মুফতির নির্দেশে পুলিশ ৭/৮ জন আহমদীকে গ্রেফতার করেছে এবং তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা সবাই দৃঢ়ভাবে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তাই সর্বদা প্রত্যেক আহমদীকে স্মরণ রাখা উচিত, এমন কোন্ যুলুম ও অকথ্য নির্যাতন রয়েছে যা তাঁর (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের উপর করা হয়নি? আমাদের উপর তার এক

দশমাংশও করা হয় না। যদি এই মূল বিষয়কে আমরা অনুধাবন করি, নিজেদের ইবাদত ও কুরবানী যদি খাঁটি রূপে আল্লাহ্‌র জন্য করেন এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত হোন যে, আমাদের জীবন এবং মরণ সবই আমাদের খোদার জন্য, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে যেখানে আমরা অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবো সেখানে প্রত্যেক আহমদী ইহজগতেও সহস্র সহস্র মৃত আত্মাকে জীবন্ত করার ব্যবস্থা করবে। অতএব, সর্বপ্রথম দোয়ার উপর জোর দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ মোতাবেক প্রত্যেক আহমদীকে পার্থিব জীবন পরিচালিত করার জন্য নিরলস চেষ্টা করতে হবে।

তিনি (সা.) ইবাদতের কীরূপ মান প্রতিষ্ঠা করেছেন? হযরত আয়শা (রা.) বলেন, **'একরাতে আমার ঘরে হুযূর (সা.)-এর পালা ছিল এবং নয় দিনের মাথায় এই পালা আসতো।' 'আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি দেখি যে, তিনি (সা.) বিছানায় নেই। আমি বিচলিত হয়ে বাইরের আঙ্গিনায় এসে দেখি হুযূর সিজদায় পতিত; আর বলছেন, 'হে আমার পরওয়ারদেগার, আমার আত্মা ও হৃদয় তোমার দরবারে সিজদাবনত।'** এই হলো, সত্যিকার প্রেমিকের সম্মুখে ভালবাসার প্রকাশ। এটি ঐসব লোকদের আপত্তির উত্তর যারা তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করে। এরপর তিনি ঘুমন্ত অবস্থায়ও তাঁর প্রিয় খোদাকে স্মরণ করার কথা বলতে গিয়ে বলেন, **'আমার দু'চোখ ঘুমায় ঠিকই কিন্তু হৃদয় জাগ্রত থাকে।'** আর এই জাগ্রত হৃদয় সর্বদা খোদার স্মরণে ব্যাপৃত থাকতো। প্রত্যেক চরম বিপদের মুহূর্তেও তিনি খোদাকে স্মরণ করতেন।

একদা তিনি (সা.) তরবিয়ত করার মানসে একজন সাহাবীর নবনির্মিত ঘর দেখে জিজ্ঞেস করেন, জানালা কেন রেখেছ? তিনি বলেন আলো-বাতাস আসার জন্য। তিনি (সা.) বলেন, **'একেবারে ঠিক কিন্তু যদি এই নিয়্যতে রাখতে, এই জানালা পথে আযানের ধ্বনি ভেসে আসবে। ফলে আমি নামাযে যেতে পারবো। তাহলে তুমি যে দু'টি উদ্দেশ্যের কথা বললে, তাতো পূর্ণ হতোই, পাশাপাশি এর সওয়াবও তুমি পেতে।'** তারপর হাদীসের আরেকটি রেওয়ায়েতে তিনি (সা.) বলেন, **'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় যদি কোনো স্বামী স্ত্রী'র মুখে খাবারের লোকমা তুলে দেয়, তাহলে সে এর সওয়াব পাবে।'** এর অর্থ কেবল মুখে খাবারের লোকমা তুলে দেয়াই নয়, বরং সঠিকভাবে স্ত্রী সন্তানের লালন-পালন। তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা।

পরিবারের দায়িত্ব পালন করা একজন পুরুষের জন্য আবশ্যক। কিন্তু সে যদি এই নিয়্যতে দায়িত্ব পালন করে যে, খোদা তা'লা আমার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তাই খোদার খাতিরে, আমার স্ত্রী, যে পিতা-মাতার গৃহ ছেড়ে আমার ঘরে এসেছে, তার প্রাপ্য অধিকার তাকে প্রদান করতে হবে, সন্তানের প্রাপ্য প্রদান করতে হবে। তাহলে এই দায়িত্ব পালনও সওয়াবের কারণ হয়, এটিও ইবাদত। যদি প্রত্যেক আহমদীর চিন্তা -চেতনা এমন হয় তাহলে বর্তমানে যেসব দাম্পত্য কলহ হয়, ছোট-খাট বিষয় নিয়ে তুই-তোকারি বলা আরম্ভ হয়, এথেকেও মানুষ রক্ষা পাবে। স্ত্রী তার করণীয় অনুধাবন করবে, স্বামী সেবার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে তাই যথার্থভাবে তা পালন করবো। আর আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে যদি আমি এমনটি করি, তাহলে সওয়াব হবে। মহানবী (সা.) উভয় পক্ষকে বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে এরূপ করো, তাহলে তোমাদের এই কর্ম ইবাদতে পরিণত হবে, তোমরা এর সওয়াব

পাবে। এটি মানুষের চিন্তা করা উচিত। আর এমন ছোট-খাট কর্মই মানুষের এই পার্থিব ঘরকে জান্নাত সদৃশ বানিয়ে দেয়।

মহানবী (সা.)-এর ইবাদত সম্পর্কে হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে, 'একরাতে আমি দেখলাম, তিনি (সা.) তাহাজ্জুদ নামাযের সেজদায় পতিত হয়ে এই দোয়া করছিলেন, **'হে আমার আল্লাহ্, আমার শরীর ও আত্মা তোমার দরবারে সেজদায় রত। আমার হৃদয় তোমার প্রতি ঈমান আনে। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক, আমার দু'হাত তোমার দরবারে প্রসারিত এবং আমি এ দ্বারা নিজ প্রাণের উপর যে যুলুম করেছি তাও তুমি অবহিত। হে মহান, যাঁর কাছ থেকে সকল প্রকার মহান বিষয় কামনা করা হয়, আমার পাপসমূহ ক্ষমা করো।'** হযরত আয়শা (রা.) বলেন, **'নামায এবং দোয়া শেষ করে তিনি (সা.) আমাকে বলেন, 'জিব্রাঈল (আ.) আমাকে এই বাক্যাবলী আমাকে পাঠ করতে বলেছেন। তাই তুমিও পাঠ করো।'**

হুযূর বলেন, এবারে মহানবী (সা.)-এর জীবনের আরেকটি দিক এখন আমি তুলে ধরছি, যা সুবিচার ও সাম্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। তিনি (সা.) বলেন, **'তোমার পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি এজন্য ধ্বংস হয়েছে। কেননা, যখন তাদের মধ্য হতে সম্ভ্রান্ত কেউ অপরাধ করতো তাকে ছেড়ে দেয়া হতো আর দুর্বল কেউ যখন কোনো অপরাধে অপরাধী হতো, তাকে শাস্তি দেয়া হতো। আমার উম্মতের ভেতর এমনটি হওয়া উচিত নয়।'** কিন্তু বর্তমান সময়ের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে ব্যাপকভাবে এটিই দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যে অবিচারের প্রচলন ঘটেছে। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ফাতেমা নামের এক মহিলা চুরি করলে মহানবী (সা.) চুরির অপরাধে তাকে শাস্তি প্রদান করেন। সাহাবীরা (রা.) তাকে শাস্তি থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত যখন কারো সাহস হয়নি তখন তাঁরা সুপারিশ করার জন্য হযরত উসামা (রা.)-কে পাঠান। তার সুপারিশ শুনে মহানবী (সা.)-এর চেহারা রাগে রক্তিম হয়ে যায়। এরপর বলেন, **'তুমি এই নারীর পক্ষে সুপারিশ করছো? কিন্তু আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি এই অপরাধ করতো তাহলে তাকেও আমি এই শাস্তিই দিতাম।'** সুবিচারের এমন মানই তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

হযরত আবু যার গিফ্ফারী (রা.) বর্ণনা করেন, **'একদা আমি দু'জন যুবককে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হই এবং সুপারিশ করি, এদের মতে এবং আমিও মনে করি যাকাত আদায়ের জন্য এদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে। মহানবী (সা.) বলেন, আবু যার, যে (ব্যক্তি) পদের আকাঙ্ক্ষা করে আমরা তাকে পদ দেই না। যখন খোদা দায়িত্ব দেন তখন কাজ করার তৌফিক দেন। যখন চেয়ে নেয়া হয় তখন কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেহেতু তুমি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছ, তুমি নিজেকে এর যোগ্য মনে করেছ, সামনে আসার তোমার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই, এখন এসব দায়িত্ব পালন করে দেখাও। আমি দেখবো তুমি কতোটা পালন করতে পারো।'**

অতএব পদের লোভ করার মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মানুষ অধিক হারে স্বীয় প্রবৃত্তির প্রকাশ করুক এটি আল্লাহ্ তা'লার পছন্দ নয়। আজও বিভিন্ন স্থানে যেসব জামাতে তরবিয়তের ঘাটতি রয়েছে, অথবা যাদের তরবিয়তের ঘাটতি রয়েছে তারা পদের আকাঙ্ক্ষা করে। জামাতের নির্বাচনের সময় অনেক সময় জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু তারা স্বয়ং নিজেকে ভোট দিয়ে বসে। যাহোক, এখন জামাতের সদস্যদের আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের বিধি-বিধান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে। কেবল নবাগত কিছু

লোক ছাড়া। কেননা স্বয়ং নিজেকে ভোট দেয়ার ব্যাপারে জামাত এ জন্যই নিষেধ করে যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, পদের আকাঙ্ক্ষা করো না। স্বয়ং নিজেকে ভোট দেবার অর্থ হচ্ছে, আমি এই পদের যোগ্য। আর আমার চেয়ে যোগ্য যেহেতু আর কেউ নেই, তাই আমাকে বানানো হোক।

কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে নিঃস্বার্থ হওয়া উচিত। কেবল নামের নয়, সত্যিকারেই নিঃস্বার্থ হওয়া প্রয়োজন। কর্মকর্তাদেরকে সর্বদা মহানবী (সা.)-এর এই বাক্যাবলী দৃষ্টিপটে রাখা কর্তব্য, **'নেতা হচ্ছে জাতির সেবক'**।

হুযূর বলেন, খিদমত, সুবিচার, সাম্য ও সরলতার উজ্জল দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখতে পাই। যদি কোথায় সফরে যেতেন অথচ বাহনের কমতি রয়েছে, তখন অনেক সময় প্রতি দুজনের জন্য একটি বাহন বরাদ্দ হলে তাঁর ভাগে যে সঙ্গী পড়েছে, তিনি যতটুকু সময় সেই বাহন নিজে ব্যবহার করেছেন ততোটুকু সময় নিজে পায়ে হেঁটেছেন এবং তাঁর সঙ্গীকে বাহন দিয়েছেন। সর্বদা এমনই ন্যায়বিচার ও সাম্যের শিক্ষা তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরপর দেখুন আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ: **وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى** (সূরা আল্ মায়েদা: ৯)। **অর্থ: 'এবং কোনো জাতির শত্রুতা যেন তোমাকে এই অপরাধ করতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার না করো। তোমরা সুবিচার করো কেননা এটি ত্বাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।'** এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। তিনি (সা.) এ প্রসঙ্গে কতো মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার একটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি: **'যখন ইহুদীদের বিখ্যাত খায়বারের দুর্গ মুসলমানরা জয় করে তখন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মাঝে খায়বারের সেই জমি বণ্টন করা হয়। এলাকাটি অত্যন্ত উর্বর এবং সুজলা-সুফলা ছিল। সেখানে অনেক খেজুরের বাগান ছিল। পাকা খেজুর বণ্টন করার সময় এলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সোহেল (রা.) আপন চাচাত ভাই মাহিসাকে নিয়ে খেজুর বণ্টন করার উদ্দেশ্যে সেখানে যান। অল্প সময়ের জন্য যখন তারা দুজন পৃথক হন তখন সেই সুযোগে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে একা পেয়ে কেউ হত্যা করে এবং তাঁর মরদেহ খাদের ভেতর ফেলে দেয়।**

অত্যন্ত প্রবল সম্ভাব্যতা এবং সাক্ষী ছিল, যেহেতু ইহুদীদের কাছ থেকে জমি দখল করা হয়েছে, তাই এর জের ধরে তাদের মধ্য হতেই কেউ হত্যা করে থাকতে পারে। কোন শত্রুতা ছিল না। তাই মুসলমানদের হত্যা করার প্রশ্নই ওঠে না। যাহোক, বিষয়টি যখন মহানবী (সা.)-এর খিদমতে উপস্থাপন করা হয়, যেভাবে আমি বলেছি, ইহুদীদের দায়ী করার মতো যথেষ্ট অবকাশ ছিল আর তাদেরকে দায়ী করা হয়েছে। মহানবী (সা.) মাহিসাকে জিজ্ঞেস করেন, তাকে ইহুদীরা হত্যা করেছে সেকথা কি তুমি কসম খেয়ে বলতে পারবে? তিনি বলেন, আমি স্বচক্ষে দেখিনি আর যেহেতু আমি স্বচক্ষে দেখিনি তাই কসম খেতে পারি না। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, ইহুদীদের কাছ থেকে তারা হত্যা করেছে কি-না তার হলফ নেয়া হবে। যথারীতি তারা হত্যার দায়িত্ব হতে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করে। হত্যার দায়িত্ব তো কেউ নিবে না। কিন্তু তারা করেনি বলে জানায়। মাহিসা মহানবী (সা.)-এর খিদমতে নিবেদন করেন, ইহুদীদের বিশ্বাস কি? শতবার মিথ্যা কসম খেতেও এদের বাঁধবে না। কিন্তু যেহেতু সুবিচারের দাবি ছিল, তাই তিনি (সা.) বলেন, যদি ইহুদীরা কসম খেয়ে বলে তাহলে রেহাই পাবে। তিনি ইহুদীদের জিজ্ঞেস করেন আর তারা কসম খায়। তারপর মহানবী (সা.) বাইতুল মাল থেকে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র রক্তপণ আদায় করে দেন।'

এরূপ ন্যায়বিচার ও আদর্শ-ই তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। জীবনের কোনো দিকই তিনি উপেক্ষা করেন নি। যে দিকেই তাকাই না কেন তাঁর আদর্শ আমরা দেখতে পাই। সুবিচারের যে উদাহরণ আমি দিলাম, বর্তমান সময় দেখুন, বড় বড় জোব্বাধারী, যারা বড় বড় মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করে, কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, আহমদীদের গালি-গালাজ করা ছাড়া এখানে আর কিছুই হয় না। খতমে নবুয়তের নামে বড় বড় বুলি আওড়ানো হয় আর সমাপ্তি ঘটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচারের মাধ্যমে।

হুযূর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সেসব নিষ্পাপ মুসলমানদের প্রতিও দয়া করুন যারা এইসব নামধারী উলামাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। আর তাদের প্ররোচনায় পড়েই অন্যায় কর্মে সম্পৃক্ত হয়। তারা বুঝতে পারছেনা যে, এ কারণেই অনেকের ঘর উজাড় হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানের হাতে যেন কোনো মুসলমান নিহত না হয়, এরূপ করতে আল্লাহ্ তা'লা কঠোরভাবে বারণ করেছেন। এর ফলে ইহকালেও শাস্তি পাবে আর পরকালের আযাব তো আছেই।

বর্তমানে এরা পরস্পরকে এভাবে হত্যা করে অথবা পরস্পরকে হত্যা করা এদের কাছে পশু হত্যার চেয়েও সহজ বা সাধারণ হয়ে গেছে। মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের সময় সর্বশেষ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন, **'তোমাদের জন্য তোমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ রক্ষা করা সেভাবেই ওয়াজিব বা আবশ্যক যেভাবে তোমরা এই দিন এবং এ মাসের সম্মান করে থাকো।'** মহানবী (সা.) পরস্পরের প্রতি পরস্পরের রক্ত এবং ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু আজ কী হচ্ছে? পাকিস্তানের প্রতি দেখুন, সেখানে একে অপরের সম্পদ লুট করছে। খোদার নামে আহমদীদের সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে। অথচ প্রত্যেক কলেমা পাঠকারী সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, সে মুসলমান।

আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের অবস্থার প্রতি রহম করুন এবং তাদেরকে এই রহমাতুল্লিল আলামীনের সত্যিকার আদর্শের উপর পরিচালিত হবার তৌফিক দিন, যাতে তারা আল্লাহ্ তা'লার দয়ার উত্তরাধিকারী হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও তাঁর (সা.)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বীয় জীবনকে সে মোতাবেক গড়ে তোলার তৌফিক দিন, আমীন।

(প্রাপ্ত সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)